আলোর তাপস

বিষ্ণু বসু

১৯৫৪। নিউ এম্পায়ার মঞ্চে বহুরূপীর'রক্তকরবী'। খুব যে একটা প্রত্যাশা নিয়ে দেখতে গেছি তাহয়ত নয়। বহুরূপীর ন াম তখন কিছুছড়িয়েছে। একটু অন্য ধরনের নাটককরেন শম্ভু মিত্র তা শুনেছি। কলেজে পড়ি। পূর্ববাংলার ছেলে, কলকাত ায় এসে থইপাই না। আমাদের সিলেবাসে ছিল 'মুক্তধারা'। অধ্যাপক পড়াতে গিয়েমন্তব্য করেন রবীন্দ্রনাথের ওধরনের নাটকগুলি বৈঠকি নাটক, ক্লোসেট ড্রামা। এগুলো নাকি শুধুপাঠের উপযোগী, অভিনয়যোগ্যতা এদের মধ্যে নেই। মন সংশয়ে ভোগে।বিস্ময়ে ভাবি, 'ডাকঘর','মুক্তধারা','রক্তকরবী' পড়তে এত ভাল লাগে,আপ্লুত করে তোলে সত্তাকে অথচ মঞ্চে উপস্থাপিত করা অসম্ভব!নিরন্তর জিজ্ঞাসা মনকে তাড়িতকরে কিসের উপর নির্ভর করে কোনও নাটকের অভিনয়যে াগ্যতা? একটিনাট্যপ্রযোজনা সফল হয়ে ওঠে কিসের ভিত্তিতে?

ছেলেবেলা থেকেই নাট্যপ্রীতি পোষণ করে আসছি।ঢাকা শহরে দেখেছি পাড়ায় বা অফিসক্লাবের প্রযোজনা -'পোষ্যপুত্র', 'কর্ণার্জুন', 'জোর বরাত', সিরাজদ্দৌলা'প্রভৃতি নাটক বা প্রহসন। তখন বুঝতাম না, এখন জানি কলকাতা মঞ্চেহইচই ফেলে দেওয়া নাটকের আলোড়ন খানিক চুঁইয়ে গিয়ে পড়ত মফস্বলে। তারই প্রভাবে পালাপরবেঢাকার কিছু উৎসাহি যুবক অবসরেঅভিনয় করতেন এসব নাটক। দেখে মুগ্ধ হতাম। অক্ষম অনুকরণে সংলাপ আউড়েকাটত হয়ত কয়েকটা দিন। বিশেষ করে 'সিরাজদ্দৌলা' ও টিপুসুলতান' প্রচন্ড প্রিয় ছিল রেকর্ডের কল্যাণে। এ দুটোনাটকের বহু সংলাপ মুখস্থ আছে এখনও। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর কণ্ঠস্বর।বাণীবিনোদ। তাই কলকাতায় এসে প্রথম সুযোগেই রঙমহলে দেখলাম'সির াজদ্দৌলা'। নির্মলেন্দুসিরাজের ভূমিকায়। ঢাকার নাট্যস্মৃতি ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেল ওঅভিজ্ঞতায়। ভাবলাম নাট্যপ্রযোজনা এর চাইতে বেশি আর কীই বা হতেপারে। মন ভরে গেল প্রাপ্তির সফলতায়।

তাই যখন নিউএম্পায়ারে দেখতে গেলাম 'রক্তকরবী' ১৯৫৪-র কোনও এক সকালেপ্রত্যাশা তেমন বেশি কিছু ছিল না। কেননা অধ্যাপকের কল্যাণে তখন তো ভেবে বসে আছি এ ধরনের নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত হওয়া অসম্ভব। তখনওজানতাম না 'ডাকঘর' রবীন্দ্র প্রযোজনা কলকাতার রসিকদর্শকদের অভিভূত করেছিল তারও প্রায় চার দশক আগে।
শু হল 'রক্তকরবী'। ভোরের ভরন্তআলোয় মালা গাঁথছে নন্দিনী। বিস্মিত হতেও ভুলে গেলাম। মঞ্চের উপর বয়ে যেতে ল াগল কালপ্রবাহ। অভাবনীয় মঞ্চসজ্জা,সঞ্চরমান, আবহ, গতিময় গান, এককও সমবেত অভিনয়ের অনবদ্য অর্কেষ্ট্রা। অ ার আলো। 'কোন আলোলাগল চোখে'! প্রথম পরিচয় ঘটল তাপস সেনের নাম ও কাজের সঙ্গে।সৌভাগ্য আমার, বাংল ার নতুন নাট্যধারার সঙ্গে প্রথম আলাপ হল'রক্তকরবী' দিয়ে।

'রক্তকরবী' নিয়ে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণেরদরকার এখানে নেই। আমার আলোচনা আলো নিয়ে। প্রথম দেখায় আলোরঅভিভব বিমূঢ় করেছিল সেই দৃশ্যটিতে যেখানে নন্দিনী মঞ্চে আসে 'সিঁদুর মেঘে রাঙা হয়ে'সংলাপটির উচচারণ নিয়ে। সাইক্লোর ামায় গভীর রাঙা মেঘে কালোরছোপ, বিষন্ন অপরাহ, ডাউন স্টেজ প্রায় অন্ধকার, নন্দিনীরউৎকণ্ঠা সঞ্চারণে বিহ্বলে অ ামরাও। তার উদ্বেগ প্রলয়ের সম্ভাবনায় সঞ্চালিত আমাদের মধ্যেও। মনে হয়েছিল নন্দিনীরআবেগতাড়িত সংলাপ আলে াকসম্পাতের মধ্য দিয়ে আছড়ে পড়ছে আমাদের সমগ্র চেতনায়। কিংবা সেই দৃশ্যযেখানে বেরিয়ে আসছে 'রাজার এঁটে া'রা। আলোয় লালচে ছোপ, সঙ্গেউদ্বিগ্ন আবহ, নন্দিনীর আর্ত হাহাকার - সব মিলিয়ে যেন মূর্ত হয়েছিলঅপ্রত্যাশিত অথচ কাঙ্খিত পরিবেশ। কখনও বুঝি নি প্রযোজনায়আলোর কাজ চেতনাকে শুধু বিহ্বল করাই নয়, তাকে জাগিয়ে তোল াও।

এ বোধ এসেছিল পরের বার ‘রক্তকরবী’ দেখতেগিয়ে। প্রথম দর্শনের বিহ্বলতা তখন খানিক থিতিয়ে এসেছে। তবুও বিস্ময় এবার অন্য। নন্দিনী চাইছে যক্ষপুরীর অন্ধকার ডালা খুলে আলো টেনে দিতে, তৃপ্তি মিত্রের আন্তরিক ব্যাকুলতার সঙ্গে ফুটে উঠলঅন্তরঙ্গ আলো। অথবা সেই দৃশ্য যেখানে বিশু-নন্দিনীর প্রায় স্বগত সংলাপ,‘দুখ জাগানিয়া’ গানের নিভৃত পরিবেশ, শোভেন মজুমদারের সামান্যভাঙা স্বরে ‘‘অল্প কিছু দেয়ার দানে আমার গান বিক্রি করতেপারব না পাগলী’’, সেই সর্বব্যাপী নির্জনতায় দুজনের অবয়বে এসেপড়ত তারের জালের ভেতর থেকে পিছলে পড়া চৌকো আলো, নাটকটি যেনসেই মুহূর্তে পেয়ে যেত নিগূঢ় অর্থময়তা। প্রযোজনাটি সমগ্রতার মধ্যেআলাদা করে ভাবতে বাধ্য করেছে কোন কৌশলে তাপস সেন রচনা করেছেনআলোর শিল্প অথবা দৃষ্টিগ্রাহ্য কবিতা। বহুরূপী না জানি কত খরচকরেছে আলোকস ম্পাতের জন্যে।

২

এখন আর ও তথ্য অজানা নয় তাপস সেন এসব শিল্পনির্মাণে হাতে পেয়েছিলেন সামান্যতম উপকরণ এবং সে উপকরণগুলোও বেশির ভাগ সময়ে নিজেদের মস্তিষ্ক উদ্ভাবিত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকিএকবার বলেছিলেন তাঁর কাছে রঙতুলি না থাকলে তিনি হাত দিয়ে আঁকবেন,হাত না থাকলে অন্য যে কোনও উপায়ে প্রবহমান থাকবে তাঁরশিল্পসাধনা। একথার মধ্যে দিয়ে তিনিবোঝাতে চেয়েছিলেন শিল্পীর কাছেউপকরণই প্রধান নয়, প্রকাশের সর্বব্যাপি আগ্রহ ত াঁরশিল্পীসত্ত্বাকে জাগিয়ে রাখে। তাপস সেনও তাই আলোর শিল্পী।

তাপস সেনের প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবি রেখে আগেএকটু আলোচনা সেরে নেওয়া যাক বাংলা মঞ্চে আলো প্রয়োগের বিবর্তন ধারাটি নিয়ে। আমরা জানি কলকাতায়যখন সাহেবরা থিয়েটার খোলেন আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তখন গোড় ায়ব্যবহৃত হত মোমের আলো। গ্যাসের বাতি ওল আরও পরে। গ্যাসের আলো বাড়িয়ে-কমিয়ে মেটানো হতমঞ্চে অ ালোকসম্পাতের অভীপ্সা। বাঙালিদের থিয়েটারেও দীর্ঘকাল প্রযুক্ত হতএ কৌশল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে এমারেল্ড থিয়েট ারের মালিক গোপাললাল শীলডায়নামো বসিয়ে নাট্যশালাকে প্রথম বিদ্যুতে আলোকিত করে তোলেন। সম্ভবত জ্বাল ানো ও নেভানোছাড়া প্রযোজনায় আলোর বিশেষ ভূমিকা ছিল না। অবশ্য নাটকও তখন‘মঞ্চস্থ’ হত , ‘প্রযোজিত’ হত না।

অনুমান করা হয় বিশ শতকের গোড়ার দশকের শেষদিকে কোনও সময়ে কলকাতার মঞ্চে ব্যবহৃত হতে থাকে পুরোপুরি বৈদ্যুতিকআলো। তবে তা ফুটলাইট, স্পটলাইট ও ফ্লাড লাইটের সীমা বোধ হয়ছাড়াতে পারে নি। তার শিল্পসম্মত প্রয়ে াগ যে খুব একটা হততা হয়ত নয়। শিশিরকুমার বিশের দশকে এসে ফুটলাইটের ব্যবহার তুলে দিলেতাকেই প্রচন্ড অ াধুনিক বলে অভিনন্দিত করেছিলেন সেকালেরনাট্যরসিকরা। অভিনেতার বিহ্বলতা ও সচেনতার প্রশ্ন শিশিরকুমারের সেই ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তি‘রাম’ হিসেবে পিতৃহৃদয়ের প্রবল আলোড়নের মধ্যেও তিনিলবকুশকে এক পাশে রেখে কীভ াবে নিজের মুখকে এগিয়ে দেন স্পটলাইটিকেধরার জন্য। অহীন্দ্র চৌধুরীর ‘ফোকাস’ তো থিয়েটারমহলে মধুর পরিহ াসবলেই পরিচিত। ১৯৫০-এ যখন ‘সিরাজদ্দৌলা’ দেখেছিলাম এখনও মনে আছেমূলত ফ্লাড ও স্পটলাইটের ব্যবহ ারকে। মৃত্যু দৃশ্যে সংলাপ - ‘‘সুখেথাক ভাইসব, বাংলার এ হতভাগ্য নবাবের বক্ষরক্তে তোমাদের সবঅশান্তি ধুয়ে মুছে যাক’’ - নির্মলেন্দু লাহিড়ী বুকে হাত চেপেকাল্পনিক ক্ষতস্থান ঢেকে হাঁটু গেড়ে থেমে থেমে কথাগুলো বলছেন, মুখ উইংসের দিকেসামান্য ঘোরানো, স্পটলাইট এসে পড়েছে তার উপর, অপ্লুত আমরা সেদৃশ্য দেখছি, অভিনয় আলো মঞ্চ ও রূপসজ্জা মিলে মনে হচ্ছে থিয়েটার আর এরচাইতে বেশি কী দিতে পারে। শিশিরকুমারের যেসব প্রযোজনা দেখেছিপঞ্চাশের দশকে তাদের আলোর কাজ তেমন অর্থবহ বলে অন্তত তখন ভাবি নি।ডিমারের ব্যবহার সাধারণ ন াট্যশালায় তখন কতটা ছিল এবং তার এফেক্ট কেমন হত জানা নেই। তবে এসবআলোকসম্পাতে পরিচালকদের যে কে ানওভূমিকা থাকত না সেকথা জানতে পারি দেবনারায়ণ গুপ্তের জবানী থেকে।তাঁর পরিচালনায় কিছু নাটকে আলোর ক

াজত করে দিয়েছিলেন মণীন্দ্র দাসওরফে নানুবাবু। নানুবাবু নাকি কাজ শিখেছিলেন কলকাতার পার্শি থিয়েটারেদীন শা ইরানির কাছে। দেব নারায়ণ গুপ্তের বিবরণ থেকে জানতে পারি এসবআলোর কাজ তেমন বিজ্ঞানসম্মত হত না। শিল্প স ম্মতও হত কি?ত্রিশ-চল্লিশের দশকে এসেও প্রযোজনাআলোর কাজটি নিষ্পন্ন করা হত নাট্য পরিচালকের অজ্ঞাতসারে। আলোর ভারথাকত যাঁর উপর তিনি নাকি মহলা চলার সময় খানিক জেনারেল লাইটিং করে দিতেন। তারপরনাটক মঞ্চস্থ ব্যবস্থা হবার দিন-দুয়েক আগে অতি সংগোপনে কিছুইলেকট্রিশিয়ান নিয়ে আলো প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা করে র াখতেন।দেবনারায়ণ গুপ্ত নাকি বহুবার নানুবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন, পরিচালকহিসেবে সেখানে হাজির থাকার বাসন া এবং পেয়েছিলেন প্রত্যাখ্যান। অথাৎপরিচালক জানতে পারছেন না তাঁর পারিকল্পনা মঞ্চে অনুদিত হতে চলেছে কীভ াবে! পরিচালক ও অভিনেতৃবর্গ ও ব্যাপারেথাকছেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

১৯৩১-এ সতু সেনআমেরিকা থেকে ফিরে এলেন কলকাতায়,নাট্য প্রযোজনার নানা কলাকৌশলশিখে। এ শহরে প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নির্মাণের কৃতিত্ব তাঁরই। নাট্য পরিচালনা শিল্পনির্দেশনাআলোকসম্পাতের দায়িত্বে তিনি জড়িয়ে ছিলেন দীর্ঘকাল। শিশিরকুমারেরনির্দেশনায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' মঞ্চস্থ হয় সে বছরেরঅগাস্ট মাসে। এ প্রযোজনার শিল্প নির্দেশক ছিলেন সতু সেন। তারপরবেশ কিছু নাটকের সঙ্গে পরিচালক শিল্প নির্দেশক অথবা এবং আলোকশিল্পী হিসেবে তাঁর সংলগ্নতা কলকাতার দর্শকদের প্লুত করেছেপ্রায় তিন দশক ধরে । কিন্তু তিনিও দেবনারায়ণ গুপ্তের ভাষাঅনুযায়ী, " পূর্বসুরীদের মত আলোর কাজটি সম্পন্নকরতেন।" সতু সেন নাকি প্রথম সঠিকভাবে স্পটলাইটেরব্যবহার করেছিলেন। মঞ্চের দুধারে দুটি অর্কল্যাম্প রাখতেন তিনি, তাতেথাকত নানা রঙের জিলোটিন কাগজসাঁটা একটি চত্র এবং সেটি ঘুরিয়ে বিভিন্ন রঙের আলো প্রক্ষেপণকরা হত মঞ্চে। সখীদের নাচের সময় এধরনের আলো খুব তারিফ পেত দর্শকের কাছে। ডিমারের প্রচলন হয় নিতখনও। দুটি পোর্সিলেনের নলের মধ্যে সাজিমাটি, সোডা ও সাবান পোরা হত।নলটিতে পজিটিভ ও নেগেটিভ তার ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলে মঞ্চ ত্রমেঅন্ধাকার হয়ে যেত। আবার তার দুটি তুলে নিলেই আলোকিত হত মঞ্চ। আলোআঁধারি দরকার হলে নলের মাঝামাঝি জায়গায় সাবধানে ধরে রাখা হত তার দুটো।

এ বিবরণের মধ্য দিয়ে আমরা অন্তত এ তথ্যটি পেয়ে যাই যে সতু সেন বিদেশ থেকেথিয়েটারের নানান বিষয় শিখে এলেও এখানে তার প্রয়োগে তেমন সফল হননি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কোনওএক সময়ে 'কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা' দেখেছিলাম মিনার্ভাথিয়েটারে, খুব আর্কষক মনে হয়নি প্রযোজনাটিকে। তবে তাঁর একটিমাত্র প্রযোজনা তাও জীবনের প্র ায় সায়াহবেলায় দেখা তা থেকেসিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়। এটুকু শুধু বলা যায়, বিদেশের মঞ্চ বিজ্ঞানদিয়ে পাবলিক থিয়েটারের অচলায়তনে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরাতে পারেন নি সতুসেন। তবু একথাও ঠিক যে বাংলা মঞ্চে সতু সেনের আ বির্ভাব নাট্যপ্রযোজনায় আলোকশিল্পীকে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করেছিল।তাই ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত শচীন সেনগুপ্তের'স্বামী-স্ত্রী' নাটকে 'আলোকশিল্পী' বলে বিজ্ঞাপিতহয়েছিল চারজনের নাম । তাঁরা হলেন প্রফুল্লচন্দ্রঘোষ,সন্তোষকুমার গাঙ্গুলি, শঙ্করকুমার ভট্টাচার্য ও দুলালচন্দ্র দাশ।১৯৩৯-এ নাট্যভারতীতে 'সংগ্রাম ও শা ন্তি' নাটকেরও'আলোকশিল্পী' ছিলেন প্রফুলচন্দ্র ঘোষ, শঙ্কর ভট্টাচার্যও কালি মিস্ত্রি। ১৯৪০-এ নাট্যনিকেতনের 'পরিণীত া'প্রযোজনার 'আলোকসম্পাত' করেছিলেন উপেন দত্ত, গণেশচন্দ্র বসুও যোগেশ চন্দ্র দত্ত। এ ধরনের উদহরণ হয়ত দেওয়া যায় আরও, তবে তার আর দরকার নেই।

৩

সতু সেন যখন মঞ্চের সংলগ্ন হয়েছেন ত্রিশের দশকে এবং'আলোকবিজ্ঞানকে' কাজে লাগাতে চেষ্টা করছেন নিজের মত করে,প্রফুল্ল ঘোষ, শঙ্কর ভট্টাচার্য, বা উপেন দত্ত প্রভৃতিরপরিচিতি ঘটছে 'আলোকশিল্পী' হিসেবে, তাপস সেন দিল্লিতে তখনপ্রায় একক ভাবনায় বুঝে নিতে চাইছেন আলোর রহস্য, মঞ্চে তারপ্রয়োগের বিবিধ কৌশল। তাপস সেন তখন কিশে ার এবং একথা সকলেরইজানা দিল্লিতে নাট্য প্রযোজনা বিষয়টি, তাও আবার বাংলা, ছিল দুষ্প্রাপ্য।তবু জিজ্ঞাসু কিশে

ারটি তাঁর শিক্ষক প্রতাপ সেনের সমর্থনে এগোলেনআলোর পথে। অবশ্য নিজের ভেতরকার তাগিতেই তাপস বেছে নিয়েছিলেন ও পথ। তাই কিছুদিন পরনিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বড়ছেলে তন তাপস নিশ্চন্ত চাকরির নিশ্চয়তা ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন বোম্বাই, থিয়েটার বা সিনেমায় আলোর কাজ শিখবেনবলে। পৃথ্বি থিয়েটারে তিনি সুযোগ পেলেন না সিনেমাতেও সুবিধে হল না। তাই স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ নাগাদ তিনি পৌঁছলেন কলকাতায়।

এবং কলকাতায় তাঁর আগমন ঘটেছিল সঠিক সময়ে।কেননা কলকাতায় তখন বাংলা থিয়েটার নতুন জোয়ার। মাত্র বছর চারেক আগেঘটে গেছে 'নবান্ন-র মত ব্যাপার। গণনাট্য সংঘ তারপর খানিক ঝিমিয়েপড়লেও প্রবলভাবে আর্বিভূত হয়েছে 'বহুরূপী', লিটলথিয়েটার গ্রুপ' প্রভৃতি সংস্থা। তাপস সেন জড়িয়ে পড়লেন বিবিধ নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে। অর্থাৎ পরিবেশটি তৈরি ছিল, শুধু সুযোগেরপ্রতীক্ষা। উত্তরকালের সৌভাগ্য তাপস সেন কলকাতায় এসেপৌঁছেছিলেন যে াগ্যতম সময়ে। কলকাতায় তাঁর প্রথম কাজ ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় 'জ্বালা' নাটকে।শুনেছি এ নাটকে নাকি আলো ার কাজদিয়েছিল কিছু 'অপার্থিব' মুহূর্ত । তারপর 'নীলদর্পণ''সাংবাদিক' এবং বিভিন্ন দলের আরও কয়েকটি প্রযোজনা। তারপর 'রক্তকরবী'। এনাটকে দিয়েই তাপস সেনের কাজের সঙ্গে আমার পরিচয় শু।

'রক্তকরবী'-তে নন্দিনী বিশুর অবয়বে যেআলোছায়ার খেলা তাপস সেন তার নাম দিয়েছিলেন 'ইকড়ি বিকড়ি' যাঁরা যুক্ত থাকতেন সেকালে, সাক্ষী ছিলেন তাপস সেনের উদ্ভাবনীপ্রক্রিয়ার, তাঁদের কেউ কেউ এ বিষয়ে বিবরণ দিয়েছেন অনবদ্য। যেমন খালেদ চৌধুরী লিখছেন ডালডারটিনের সাহায্যেও তাপস সেন তৈরি করতেনঅপরূপ মঞ্চ মায়া। খালেদ চৌধুরীর ভাষায়, " ঘরোয়াভাবেতিনি তাকে বলতেন, 'দুধের বালতি'। তিনি যখন স্টেজে রিহার্সালেগিয়ে আলোর নির্দেশ দিতেন তখন কয়েকটি শব্দ শোনা যেত। 'ইকড়িবিকড়ি' সরাও 'দুধের বালতি' ওলটাও, 'বেবী' কাটোইত্যাদি।" তারপর কৌতুক মন্তব্য করেছেন খালেদ চৌধুরী," আচমকা যদি কেনোও বাইরের ব্যক্তি গিয়ে উপস্থিত হতেনতাহলে 'দুধের বালতি' ওল্ট ানোর সঙ্গে 'বেবী কাটা'রসম্পর্ক শুনে চমকে উঠতেন।"
তাপস সেন এইরকমই। অতি সামান্য উপকরণ দিয়েতিনি সৃষ্টি করতে পারতেন মহাকাব্য। আলোকবিজ্ঞানকে তাই তিনি নিয়েএসেছেন শিল্পের স্তরে। বাংলা থিয়েটারে প্রথম এবং এখনওপর্যন্ত শ্রেষ্ঠআলোকশিল্পী তাপস সেনই।
'অঙ্গার' যখন মঞ্চস্থ হয় উৎপল দত্তেরপরিচালনায় মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯৫৯-এ তার শেষ দৃশ্যে খনিগর্ভে জলেরত্রমসঞ্চ ার দর্শকদের স্তম্ভিত করেছিল। ভূগর্ভে খাদের মধ্যে আটকে পড়েআছে কিছু কয়লা কাটার শ্রমিক, বিস্ফোরণ ঘটে গেছে খা নিক আগে, তারা জানেনা আদৌ বাইরের আলো আবার দেখতে পাবে কিনা, প্রাণ বাঁচানোরপ্রাণান্তিক প্রয়াস, ঠিক তখনই সেইশ্বাসদ্ধপরিস্থিতিতে এক ফোঁটা জলেরশব্দ দর্শকদের চেতনায় প্রবলভাবে আছড়ে পড়ত। তারপর সেই টান ট ান উত্তেজনায় খাদ ভরেউঠেছে জলে, সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ যেন সেই খাদটি, তখন আলোরপ্রক্ষেপে বাস্তবের চরম বিভ্রমকেও হ ার মানিয়েছিল। যাঁরা সেইবিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী তাঁদের মনে হয়েছিল এ ধরনের আলোকসম্পাতেরজন্যে দরকার প্রচুর টাকা। কেননা বিশাল যান্ত্রিক পরিকাঠামো না থাকলে এ ধরনেরপরিকল্পনা সার্থক ও নান্দনিক করে তোলা অসম্ভব। অথচ ও অসম্ভবকেও সম্ববকরেছিল তাপস সেনের সৃষ্টিশীলতা। উত্তরকালে আমরা জেনেছি যখন এ জলেরদৃশ্য দেখানে ার সিদ্ধান্ত হল, পরিচালক স্বয়ং সন্দেহসম্পন্ন, দলে অর্থের দাণঅভাব, তাপস সেন হাল ছাড়েন নি। চিন্তিত উদভ্রান্ত চিত্তে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন মিনার্ভাথিয়েটারের ভেতরে ইতস্তত। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়েছিল,'একজিট' লেখা ভাঙা টিনের ব াক্স ও অনুরূপ কিছু উপকরণযেগুলো চলে গিয়েছিল বাতিলের ভাঁড়ারে। সেগুলি সংগ্রহ করে তাদেরসাহায্যে তিনি নির্ম ান করে নিয়েছিলেন নিজস্ব অস্ত্র এবং তার সুনিপুণপ্রয়োগে প্রযোজনাকে করে তুলেছিলেন সক্ষম। বিদেশীরাও অনেকে তাঁর উপকরণের'সামান্যতা' দেখে বাক্হীন হয়ে পড়তেন। এ বিষয়ে 'অঙ্গার'নাটকের পরিচালনায় উৎপল দত্তের দীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃতি করছি, ".....জলের উপর যেআলোটা ফেলত সেটা ছিল সচল। এক কথায় বলতে পারি - 'সচল কাট আউট '। এর অন্য কোনও পরিভাষা আমার জানা নেই। কেন না এটা এখানে ত নয়ই, ঝিনাট্যশালায় কখনও হয়নি।এভাবে একটা লাইটিং করা যায় এটা তাপস ছাড়া বিশ্বে কেউ ভাবেনি।" ঝিরঙ্গালয়ের অনুপুঙ্খ যাঁর নখদর্পণে সেই উৎপল দত্ত যখন এমনমন্তব্য করেন তার সারবত্তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।তাছাড়া "তাপস ফুট লাইট ব্যবহার করত না। কিন্তু

ঐ দৃশ্যের জন্যফুট লাইটের জায়গায় এমন একটা লাইট বসাল যার আলোটা খুব কড়া এবংতার সামনে একটা ঘূর্ণায়মান চাকা লাগাল। এবার এটা ঘোরবে কে? বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা করার সঙ্গতিআমাদের নেই, তাই ঐ আলোর নিচে মঞ্চের কিছুটা অংশ ফুটো করে দেওয়াহল। তাপসের একজন সহকারী মঞ্চের নিচে গিয়ে হাত দিয়ে চাকাটা ঘোরাত।এরকম অজস্র পরীক্ষা তাপস করেছে যা ঝি ইতিহাসে কেথাও নেই, তাপসেরনিজস্ব সৃষ্টি।" শুধু তাই নয় দৃশ্যে আলোর বিশেষ এফেক্টআনার জন্যে প্যান্ট গুটিয়ে একটি ম্লান আলো নিয়ে তাপস সেন কখনও কখনওনিজেই ঢুকে পড়তেন প্রায় অন্ধকার মঞ্চের মধ্যে। একথা জেনেছি তাপসসেনের কাছ থেকেই। থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'মহাকালীর বাচ্চা'তেওঅনুরূপ দরকারে 'নেপথ্য শিল্পী' তাপস সেন এসেছিলেন মঞ্চেরউপরে।

'সেতু' নাটকে মঞ্চের উপর রেল ইঞ্জিনেরহেড লাইট বাংলা থিয়েটারে কিংবদন্তী হয়ে আছে। 'সেতু' আমিদেখি নি। তবে শুনেছি ইঞ্জিনের হেড লাইট। সিগনালের লাল নীল আলো, রেলগাড়িরআওয়াজ মিলে তাপস সেন এমন বিভ্রমের সৃষ্টি করতেন যা নাকিবাস্তবকেও ছাড়িয়ে যেত। বহু দর্শক নাকি শুধু এ দৃশ্যটির জন্যই বারবার'সেতু' দেখতেন এবং এ দৃশ্যের পর চলে যেতেন হল ছেড়ে। আমাদেরক্ষোভ এ সকল নির্মাণ-প্রক্রিয়া, সামান্য উপকরণ দিয়ে অসামান্যসৃষ্টি তার বর্ণনাই শুধু পাই। কিন্তু কোন্ প্রযুক্তি বিদ্যা কাজকরেছিল এসব ক্ষেত্রে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এখনও পাই নি তাপস সেনেরকাছ থেকে।

৪

'অঙ্গার' নাটকে আবশ্য ব্যক্তিগতভাবে খাদেরদৃশ্যের থেকে আমার বেশি ভাল লেগেছিল রেসক্যু অপারেশনের দৃশ্যটি। বিপুলকর্মব্যস্ততা, প্রচুর যন্ত্রপাতির দ্রুত সঞ্চারণকে ব্যক্ত করছিল আলোর চঞ্চলতা। এ চঞ্চল্য যেনদৃষ্টির বাইরের চেহারা ছাপিয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল অপেক্ষায় ব্যাকুলখাদে আটকে পড়া শ্রমিকদের আত্মীয়স্বজনের উদ্বেগের গভীরতার মধ্যে। তাদের মানসিক বিপর্যয়কে আলো যেননিক্ষেপ করছিল দর্শকদের চেতনায়, তাদের করে তুলছিল সমমনস্ক। অথবাসেই দৃশ্যটি যেখানে মায়ের উপর অভিমান করে বিনু না খেয়ে চ।লে গেল খাদেনামতে, ত্রাসিত রূপা ছুটে এসে মায়ের সামনে দাঁড়াল রূপার বাবা বিনুরপ্রতি বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও জানালেন কাজটা ভাল হল না, তখন আশর্চ্য একবিষণ্ণ আলো আমাদের জড়িয়ে ধরত।

'কল্লোল' নাটকের ঐশ্বর্যময় প্রযোজনায়শেষ দৃশ্যটি সব মিলিয়ে সকলকে প্রভাবিত করেছিল। খাইবারে নাবিকদের'নো সারেন্ডা'র জাহাজের উপর এরোপ্লেনের সচল ছায়া ও তার আওয়াজ এক আশর্চ্যঅভিঘাতের সৃষ্টি করত। এ দৃশ্যের আলোচনা সমাপ্তির পর আমরা করতামঅবশ্যই। কিন্তু বোধহয় বেশি নাড়া দিত সেই দৃশ্যটি যখন ওয়াটার ফ্রন্টবস্তি থেকে মিলিটারিদের উপর নিক্ষেপিত হচ্ছে বোমা,আপস্টেজে আগুনের প্রতিভাস, সারা প্রেক্ষাগৃহেবিস্ফোরিত হচ্ছে "জাগা হায় ইনসান জামানা বদল রহা" এবংকৃষ্ণাবাঈ, সংগ্রামী শার্দুলের সিংহিনী না, একটি শিশুকে কোলে তুলে নিয়েসেই দৃশ্যে দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করত, "কি রে, বড় হয়ে পারবিনা তুই ওরকম লড়তে," তখন অভিনয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত করত আলো।অথবা খাইবার জাহাজে ডেকের দৃশ্যটি। সুভাষ এক হাতে সাঁতার কেটে উঠেএসেছে, নাবিকদের জন্য খাবার নিয়ে, লক্ষ্মীবাঈকে কেন্দ্র করে সুভাষ শার্দুলেরটেনশান, কিছু উত্তেজিত সংলাপ,তারপর যখন শীতার্ত অতিথি সুভাষকে ওভারকোট দিয়ে ঢেকে তাকে সঙ্গেনিয়ে নিশান্ত হত শার্দুল, আবছা আলোছায়াতে দৃশ্যটি ব্যঞ্জনাময় হয়েউঠত, মানুষের মনে মানুষের প্রতি আশর্চ্য এক আস্থা এনে দিত।

উৎপল প্রযোজিত 'ফেরারী ফৌজ' অন্যকিছু প্রযোজনার জাঁকজমকের মাঝে পড়ে যেন একটু ম্লান হয়ে আছে। অথচনানা দিক থেকে এ প্রযোজনাটিকে ব্যতিক্রম মনে হয়। শোভা সেন, সত্যবন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধান বন্দ্যোপাধ্যায়, অণ রায় বানীলিমা দাস ও অন্যান্যদের অভিনয়ের জন্যেই শুধু নয়, একটিমাত্র সেট বিভিন্নস্তরে ব্যবহৃত হয়ে প্রযে

াজনার একটি বহুতলতা বহন করে আনত।অশোকদের বাড়ি, রাধার ঘর, জাহাজঘাটা, চণ্ডি মণ্ডপ, নিজস্ব চারিত্র্যেউদ্ভাসিত হয়ে উঠত। যতদূর মনে পড়ছে একবার একই সঙ্গে সম্ভবত পাঁচটিজোন দেখানো হচ্ছে এবং প্রতিটি স্বভাবত স্বতন্ত্র। বৈচিত্র্যের মধ্যে এমনঅসাধারণ ঐক্য মঞ্চে বোধহয় বেশি দেখা যায় না। কাল ও স্থানের যে তারতম্যএ প্রযোজনা দাবী করে তা মিটিয়েছিল উৎপল দত্তের নিপুণ পরিকল্পনাউপযোগী মঞ্চ নির্মাণ এবং অবশ্যই তাপস সেনের আলো। বিভিন্ন 'মুড'ও 'টেনশন' মূর্ত হয়ে উঠেছিল আলোর ঐর্যে। অশোকের উপরঅত্যাচারের দৃশ্যটি আলো আঁধারিতে বাঙময় হয়ে উঠত। শেষ দৃশ্যেশান্তি রায় চরিত্রে উৎপল যখন বলতেন, ''আমাকে মারবি কেনরে কুমুদ?''---আলো যেন অধিকার করে নিত সমগ্র মঞ্চটিকে। খুববেশি করে মনে পড়ে ফাদার ফ্লানাগানের মৃত্যুদৃশ্যটি। ভুল করে ছোঁড়াহয়ে গেছে বোমা, বিস্ফোরণের প্রবল আওয়াঝ, সেতুর উপর আহত আর্তফ্লানাগানের প্রবেশ এবং তার সকলের জন্যে মঙ্গলকামনার উচ্চারণ, পেছনথেকে আলো আসছে, ডাউন স্টেজে অসহায় বিপ্লবীর দল---সব মিলিয়ে যেনমহাকাব্যিক মুহূর্ত।

'চার অধ্যায়' নাটকে আবার অন্য ধরণেরআলো করেছিলেন তাপস সেন। বিকেল। মঞ্চের প্রায় মাঝখানে একটিচেয়ার, এলা অতীন আত্মমগ্ন কথোপকথনে ক্রমে উপনীত হয় অতীতে,''প্রহর শেষে রাঙা আলোয় সেদিন চৈত্র মাস'', শম্ভুমিত্র তৃপ্তি মিত্রের অনবদ্য হৃার্দ্য স্বর, অকস্মাৎ অতীন সুইচ টিপেজ্বালিয়ে দিত আলো, সঙ্গে সঙ্গে সারা পরিবেশটি যেন পেয়ে যেত একটি সমগ্রতা।অথবা এ নাটকেই শেষ দৃশ্যে ছাতের উপর অতীন ও এলা, দূরে বাড়িতেবাড়িতে জানালার আলো, দুজনের মুখে দুটি স্পট। তারপর একে একে নিবতেথাকত বাড়িগুলোর আলো। দর্শকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বোধ জন্মাতদুজনের মধ্যে 'এবারের পালা হল শেষ'। আলো দিয়ে তাহলে কবিতালেখাও যায়?
যায় যে তার প্রমাণ 'রাজা'। অন্ধকারঘরে সুদর্শনার অন্তহীন প্রতীক্ষা, তৃপ্তি মিত্রের স্বরে উৎকণ্ঠব্যাকুলতা, অদৃশ্য রাজা শম্ভু মিত্রের গলায় গভীর হয়ে উঠত। তারপর রাজাসম্পর্কে সুদর্শনার সেই আশর্চ্য উপলব্ধির বর্ণনা, সে কতরূপে দেখে থাকেরাজাকে। রবীন্দ্রনাথের ব্যঞ্জনাময় সংলাপ অল্প আলো আধাঁরে যেন কাঁপিয়েদিত আমাদের একাগ্র চেতনাকে। এখনও সেই ছবিটি দেখি সুদর্শনাবেশী তৃপ্তি মিত্রমালাসহ বাড়িয়ে আছেন হাত, মাথায় ঘোমটা, গ্রীবায় নমনীয়তা ও দৃঢ়তামেশামেশি, আলো যেন তাঁর কিনারা ছুঁয়ে সংহত আভাসে চিরন্তনতায়পৌঁছেছে।
'রাজা অয়েদিপাউস' নাটকে নিজের পরিচয়জানার পরে বেরিয়ে আসত রাজা, শম্ভু মিত্রের স্বরে সমুদ্র এবং তাপস সেনেরআলো। কোনও স্পটলাইট দিয়ে নয়, ফুটলাইটের আলো সারা মঞ্চে, সব মিলিয়েযেন ধবস্ততার প্রতিরূপ। বিশাল ব্যক্তিত্বের এমন সমারোহপূর্ণ পতনযেন পূর্ণতা পেত না শম্ভু মিত্রের অভিনয় ও তাপস আলো ছাড়া। অথচ তাপস সেনফুটলাইটের ব্যবহার তেমন পছন্দ করেন না।

৫

এমনি হয়ত করা যায় একটির পর একটি প্রযোজনানিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা যাদের সঙ্গে সম্মাসে উচচারিত হতে পারেন তাপসসেন। অনুভূতি ও মননের প্রায় প্রতি পরতে তিনি তুলতে পারেনতরঙ্গ। 'পুতুল খেলা'য় দম দেওয়া পুতুলটির উপর আলো ফেলেতিনি যেমন সৃষ্টি করতে পারেন উত্তুঙ্গ নাটকীয়তা আবার একই সঙ্গেলেটার বক্সটিও আলো প্রক্ষেপণের নানা কৌশলে হয়ে উঠতে পারেমৃদু কণ্ঠ এক চরিত্র। ড. রায় (কুমার রায় অভিনীত) যখন বিদায়নিতে আসতেন বুলু বেশী তৃপ্তি মিত্রের কাছে, একটি নরম আলোর আস্তরণক্রমে যেন নেমে আসত দর্শকদের চেতনার উপর। থিয়েটার ওয়ার্কশপের'আখামা'য় দেখা যেত কুক্ষেত্র। মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ,সাইক্লোরামায় ভাঙা ও রথের চাকার প্রতিভাস, আবছা অন্ধকারেমঞ্চের উপর তিনটি চরিত্র সহজেই বিশাল ট্র্যাজেডির প্রতিরূপ গড়ে দিত।

অথবা থিয়েটার ওয়ার্কশপেরই 'মহাকালীরবাচ্চা'। দেবাশিস দাশগুপ্তের সুরে 'চলো সোনামুখী গ্রামেচলো' গানটি গেয়ে যখন মঞ্চের উপর দিয়ে এগিয়ে চলত একটি একটিকরে চরিত্র, স পেন্সিলের মত টর্চের আলো পরিবেশটিকে অন্তরঙ্গ করেতুলত। 'বেলা অবেলার গল্পে' হারাধনের যখন স্ট্রোক হয়,বাল্বের ফিলামেন্ট দিয়ে এক অদ্ভুত আলোর জাল তৈরি

করে সিচুয়েশনটিরআর্তি বুঝিয়েছিলেন তাপস সেন। বাল্বের ফিলামেন্ট দিয়েআলোপ্রক্ষেপণের এমন অনিবার্য আলোর ভ াবনা শুধু শিল্পময় নয়,মৌলিকও। অথবা সেই দৃশ্যেই সুমতির মুখের উপর এসে পড়ত নীল সবুজেমেশানো আলো, চরিত্রটিও আর্তি ও ভীতি যেন মূর্ত হয়ে উঠত।

কিংবা ধরা যাক 'গ্যালিলওর জীবন'প্রযোজনাটির কথা। গ্যালিলিওর ভূমিকায় শম্ভু মিত্র। শেষ দৃশ্যে তিনিখেতে শু করেছেন। পরিস্থিতিকে নতুনতর মাত্রায় নিয়ে যাবার জন্যেতাপস সেন আলো ফেললেন শুধু খাবার প্লেটটির উপর। প্রতিফলিতআলো এসে পড়ল গ্যালিলিওর মুখে। মুখে মুখে নয়, শুধু বুঝি চোখ দুটিরউপর। এক লহমায় পৌঁছে গেলেন ইতিহাসে! একই সঙ্গে দুটি নাট্যদলে একইনাটক প্রযোজনায় আলো তাঁর হাতে হয়ে উঠতে পারে পৃথক পৃথকভাবে দ্যুতিময়। গান্ধার ও থিয়েট্রন সম্প্রতি একই সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছে'বিসর্জন'। দুটি প্রযোজনাতে আলোর পরিকল্পনাপুরোপুরি আলাদা। থিয়েট্রনের 'বিসর্জন'-এ যেন অন্ধকারের ব্যবহারএকটু বেশি, তার সঙ্গে খানিক লাল ও সবুজ। তুলনায় গান্ধ ারের'বিসর্জন' সামান্য দৃপ্ত।

সম্প্রতি দুটি প্রযোজনায় তাপস সেন অন্ততবর্তমান লেখককে বেশ আলোড়িত করেছেন। নাটক দুটি হল নান্দীকারপ্রযো জিত 'শঙ্খপুরের সুকন্যা' এবং সংস্কৃতি সাগরের 'দ্যরয়াল হান্ট অব দ্য সান'। প্রথম দলটি, সকলেরই জানা, কলকাত ার,পরিচালক দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। অপর দলটি বোম্বের, পরিচালক ফিরোজখান। দুটি প্রযোজনাতেই দেখা গেল তাপস সেন নির্ভর করছেন না মঞ্চেরউপর ব্যবহারযোগ্য পরিচিতি আলোর যন্ত্রসমূহ। তাঁর প্রয়োগেরআওতায় চলে এসেছে প্রেক্ষাগৃহের আলোগুলোও।'শঙ্খপুরে' দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলতে থাকে দর্শকদের মাথার উপরকারআলো, তা প্রতিফলিত হয়ে প্রযোজনাটিকে করে তুলেছে একটুআলাদা। তার ফলে মঞ্চে ও প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে তৈরি হয়ে চলেছেঘনিষ্ঠ বন্ধন। যতদূর মনে পড়ছে, 'তিতাস একটি নদীর নামে'ওতাপস সেন ব্যবহার করেছিলেন প্রেক্ষাগৃহের আলো, কিন্তু তা তখনতেমন গভীরতর অর্থ নিয়ে আসেনি। 'দ্য রয়াল হান্ট অব দ্য সান' প্রযোজনাতেও দেখা হল হলঘরের প্রায় আধাআধি পর্যন্ত সিলিংয়ের আলোগুলোকেতাপস সেন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রয়োগ করছেন মঞ্চে। ফলে পুরোপ্রযোজনায় এসে যাচ্ছে একটি স্বতন্ত্র এফেক্ট।

এ নাটকেই আপ স্টেজে প্রতিষ্ঠিত একটিগোলকের উপর নানা ধরনের ও রঙের আলো ফেলে তাকে বিবিধ ব্যঞ্জনায়দ্যে াতনাময় করে তুলেছেন। এ গোলক যেন কখনও চন্দ্র সূর্যর প্রতিরূপ,কখনও বা কালচক্রের প্রতীক। তার ফলে যে অভিঘাত সৃজিত হচ্ছিল তাঅতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে গ্রথিত করে দিচ্ছিল একই ধারাবাহিকতরা সূত্রে।নাট্যক্রিয়া তখন আর সীমিত থাকছিল না শুধু মাত্র মধ্যযুগের ইনকা সভ্যতায়,তার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হচ্ছিল আধুনিকতরও প্রতিভাস। ন াটককার ওপরিচালকের অভীপ্সা অবশ্যই পূর্ণতা লাভ পেত না আলোর এ স্পর্শ ব্যতিরেকে।

থিয়েটার ওয়ার্কশপের সাম্প্রতিক প্রযোজনা'বেড়া'। ট্রয় মকসন নামে একজন আমেরিকান নিগ্রোর ব্যক্তি জীবনেরযন্ত্রণার কাহিনী। পুরো নাটকের অলোক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণনিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। সরাসরি চলে অ াসছি শেষ দৃশ্যের আলোয় ট্রয় মকসন প্রয়াত, তার মৃতদেহে যাবে মাটির নীচে, স্ত্রী রোজ মকসনএখনও তার প্রতি বহন করে চলেছে তির্যক আবেগ, দীর্ঘকাল পরে ছোটছেলেকোরি ফিরে এসেছে বাড়িতে, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল যে, ট্রয়ের অবৈধ সন্তান মেয়ে রেইনেলএকটু বড় হয়েছে। ভাইবোন এই প্রথম দেখছে দুজন দুজনকে। ত ারপরকোরি ও রেইনেল মিলে ট্রয়ের প্রিয় গানটি তুলে নেয় গলায়,'আমার একটি কুকুর ছিল নামটি যে তার ব্লু'। অদ্ভুত বিষণ্ণতা ক্রমেগ্রাস করতে থাকে সকলকে। তারপর রোজ ঘরের বাইরে আসে। সবাই চলেযায় ট্রয়ের শেষকৃত্যে যোগ দেবার জন্যে এমনকী রোজও। রোজ শুধু মঞ্চে একাদাঁড়িয়ে সামান্য সময়ের জন্য দেখে নেয় তারই মত নিঃসঙ্গ বা ড়িটিকে। একটানরম হলুদ আলোর মধ্য দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয় রোজ। তারপরেই মঞ্চে ঘটেযায় প্রায় এক অলৌকিক ঘটনা। হঠ াৎ আলো তার আভা পালটে ফেলে,মঞ্চের পর দেখা দেয় সবুজ নীল ম্লান আলো। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা মঞ্চটি যেন ভরেযায়

অব্যক্ত গানে, 'আমার একটি কুকুর ছিল নামটি যে তার ব্লু' ট্রয় মকসন ও তার কুকুর মুহূর্তে যেন একাত্ম হয়ে পড়ে।

এ নাটকের পরিচালকের কাছে জেনেছি তিনি নাকিগোড়ায় শেষ দৃশ্যের পরিকল্পনা করেছিলেন অন্যভাবে। সে অনুযায়ী আলোরছকও করে ফেলেছিলেন তাপস সেন। কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ হবার মাত্র কিছুদিনআগে পরিচালক শেষ দৃশ্যটিকে বিন্যস্ত করেন নতুনভাবে। তাঁর শঙ্কাছিল তাপস সেন এ পরিবর্তন মেনে নেবেন কিনা। তাপস সেন বিরোধিতা করেননিনতুনতর পরিকল্পনার, বরং সহজেই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিলেন,আলো ব্যঞ্জনা ও দ্যুতিময় হয়ে উঠল আরও।

এমনিই তাপস সেন। তিনি কল্পনাকে প্রসারিতকরতে পারেন, তাই মঞ্চে তিনি অমোঘ। তাই তিনি 'বারে বারেই নূতন,ফিরে ফিরেই নূতন'।

৬

কিন্তু তাপস সেনের অন্য এক পরিচয় আছে। সেটিও কমদ্যুতিময় নয়। এবার আসা যাক সে প্রসঙ্গে। ষাটের দশকের মধ্যভাগেউৎপল দত্তের 'কল্লোল' নাটকটি কলকাতাকে কতটা কল্লোলিত করেতুলেছিল তা আজ ইতিহাস। বাষট্টিতে ভারত চীন সংঘর্ষের সুযোগে সারা দেশেতখন কমিউনিস্ট বিরোধিতায় ঝড়। 'দেশ' পত্রিকায়'শিল্পীর স্বাধীনতা' শীর্ষক ফিচারে পশ্চিমবঙ্গের তাবড় তাবড়লেখক নিজেদের 'স্বাধীনতা' দেখাতে গিয়ে কমিউনিস্টদের কুৎসিৎগালাগাল দিচ্ছেন। সাম্যবাদী শিবিরে বহু নেতাই তখন জেলের ভেতর, বিনা বিচারেবন্দী থেকে 'নাগরকিতার স্বাধীনতা' উপভোগ করছেন। সোভিয়েতরাশিয়ার বিংশতি কংগ্রেসে স্তালিন বিরোধিতা নামে সংশোধনবাদ যখনপ্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃত পেয়ে গেল, তার পর থেকে এ দেশেরকমিউনিস্ট পার্টিতে এল বিভেদের পালা। ভারত চীন সীমান্তসংঘর্ষ এ বিভেদকে বিচ্ছেদের পর্যায়ে পৌঁছে দিল। দেশভক্তির পরাকাষ্ঠায়এক গোষ্ঠী পেল কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের প্রশ্রয়, অন্য গোষ্ঠীবুঝে নিতে চাইল আন্তর্জাতিক শক্তিবিন্যাসের সঠিক স্বরূপটিকে।দ্বিতীয় গোষ্ঠীর উপর তখন নেমে এল বহুবিধ নিপীড়ন, দেশের শত্রু বলেওচিহ্নিত হলেন সমর্থকরা। প্রতিবাদের কোন পথও খোলা রইল না। জরীঅবস্থা ও ভারত রক্ষা আইন টুটি টিপে ধরল যাবতীয় বিরোধিতাকে,এমনকী সত্যকে চিনে নেবার চেষ্টার উপরও পড়ল আঘাত। সারা দেশেসরোধী হাওয়া, সরকারের কঠোর দণ্ডনীতি এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়েতথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলোর উন্মত্ত উল্লাস। যে কোনওধরনের সত্যই তখন তাদের কাছে প্রতিবাদ ওরফে দেশদ্রোহিতা। আইনিসন্ত্রাসের শেকলে আবদ্ধ তখন পৃথিবীর 'বৃহত্তম গণতন্ত্র'।

প্রতিবাদ নেই, আন্দোলন নেই, শুধু আছে চাপা ক্রোধআর ধিক্কার। এবং 'বাতাসে বাদের গন্ধ'। দ্বাস উৎকণ্ঠা,রাজনৈতিক গুমোট। উত্তেজনা সংহত বাংলার মানুষ তখন আবেগমুগ্ধপ্রত্যাশায় কাঁপছে---ঝড় আসছে।

ঝড় এল। ১৯৬৫-তে মিনার্ভায়, 'কল্লোল' নিয়ে।সারা দেশের যাবতীয় প্রতিবাদ এসে জড়ো হল খাইবার জাহাজে, ওয়াটারফ্রন্ট বস্তিতে। খাইবার জাহজে নাটকীয় অনিবার্যতা নিয়ে বৃটিশ ওকংগ্রেসী পতাকাকে ক্রমে সরিয়ে উড়ত লাল পতাকা, সঙ্গে'আন্তর্জাতিক' সংগীত, প্রতিটিদর্শকের চেতনায় যেনসংহত হত সমগ্রতার বিপ্লবী বোধ। মনে পড়ে ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তিথেকে যখন মিলিটারিদের উপর নিক্ষেপিত হচ্ছে 'জাগা হায় ইনসানজমানা বদল রহা' এবং কৃষ্ণাবাঈ, সংগ্রামী শার্দুলের সিংহীনী মা, একটিশিশুকে কোলে নিয়ে সেই দৃশ্য দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'বড় হয়েতুই পারবি না ও রকম লড়তে?' শোভা সেনের সেই তীক্ষ্ণউচ্চারণে সারা দেশের প্রতিবাদী মানুষের ভীত শৈশব যেন এক লহমায় কেটে যেত, সংক্ষোভের তীব্র আবেগ চার দেওয়াল ভেদ করে ছড়িয়ে পড়তপ্রত্যয়ী দায়িত্বের সমগ্রতায়। এখনও মনে পড়ে, 'কল্লোল' দেখারদ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে নাটক শেষ হতেবেরিয়ে এসেছিলেন বলরাজ সাহানী তার আপ্লুত অভিব্যক্তিতে ছিলপ্রত্যাশা পুরণের সানুরাগ বিহ্বলতা। পৃথিবীতে প্রতিবাদের স্বরতাহলে বন্ধ করা যায় না, প্রতিরোধের শক্তি তাহলে শেষ হয় না।

স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেস ক্রুদ্ধ হল।তারা তারস্বরে চেঁচাল 'কল্লোল' নাটকে উৎপল ঘটিয়েছেনইতিহাসের বিকৃতি, নৌ-বিদ্রোহের সময় কংগ্রেস ছিল নাকি ধোয়া তুলসীপাতা,কমিউনিস্টদের তেমন ভূমিকা নাকি ছিল না না

বিকদের সেই অসম সংগ্রামে,এমন কি খাইবার নামে কোনও জাহাজের অস্তিত্ব ছিল না। বড় মালিকানারপত্রিকাগুলো শুধু বিরূপ সমালোচনা করল না। তারা একযোগে সিদ্ধান্তনিল 'কল্লোল' নাটকের বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে না তাদের ক াগজে।'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' চ্যালেঞ্জ নিয়ে জানাল সব পত্রিকা যেমন কোনও কোনও নাটকের বিজ্ঞাপন ছাপে না, তেমনি কোনও কোনও নাট্যদল সব কাগজেতাঁদের বিজ্ঞাপন ছাপান না। আর সারা কলকাতা ভরে গেল একটি অসাধ ারণপোস্টারে, 'কল্লোল চলছে চলবে'। পোস্টারে ঘোষিতপ্রত্যয় সত্য বলে প্রমাণিত হল। 'কল্লোল' থেমে থাকল না।লক্ষ লক্ষ মানুষ ভরে তুলল মিনার্ভা। 'চলছে চলবে' ধবনিতহল হাজারো কণ্ঠে। ৬৬-র গোড়ায় খাদ্য আন্দোলনে এ 'চলছে চলবে'রঅবদান কম ছিল না। যে শ্লোগানটি নিয়ে তখন মেতে উঠেছিল সারা কলকাতা সেই 'কল্লোল চলছেচলবে' যাঁর বে াধিপ্রসূত তিনি হলেন তাপস সেন। তিনি তখন লিটলথিয়েটার গ্রুপের সভাপতি। সংস্থার বহু ঝক্কি তাঁকে সামলাতে হত তখন।'কল্লোল' নিয়ে শাসক সরকার ও তার দলের কাছ থেকে যেসব আক্রমণআসত এবং যারা প্রশ্রয় পেত বুর্জোয়া পত্রিকাগুলোর কাছে সে সকল যৌথ নোংরামিকেপ্রতিরোধ করেছে গোটা দল। উৎপলকে গ্রেপ্তার করা হল, স্বাধীনত ারপর পশ্চিমবঙ্গে রাজরোষে প্রথম বন্দী হলেন একজন অগ্রগণ্য নাট্যকর্মী, অহিংসসরকারের গণতন্ত্রী মুখোশ অপাবৃত হল নির্লজ্জতা নিয়ে। 'কল্লোল'কিন্তু বন্ধ হল না। এ প্রযোজনার নাটককার নির্দেশক অন্যতম অভিনেতা চলেগেলেন জেলের মধ্যে। তাতে অবশ্য দলের সদস্যরা দমে গেলেন না। নিয়মিত মঞ্চস্থহতে লাগল 'কল্লোল', পাশে এসে দাঁড়ালেন এখানক ার সচেতন নাগরিক।এ সংকটের সময় এল.টি.জি-কে সমর্থভাবে চালিয়ে নেবার দায়িত্ব পালনকরেছিলেন সকল ন াট্যকর্মী, এবং অবশ্যই তাপস সেন।

অথচ তাপস সেনের পরিচিতি নেপথ্য শিল্পী হিসেবে।তিনি থাকেন মঞ্চের বাইরে। পাদপ্রদীপের আলোয় আসার দরকার হয় নাতাঁর। যদিও শুধু পাদপ্রদীপ কেন পুরো-মঞ্চের আলো নিয়ন্ত্রণের ভারথাকে তাঁরই উপর। মঞ্চে নিছক আলোক প্রক্ষেপণকে বিজ্ঞানেরপর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন সতু সেন। তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসুরী তাপস সেনতাকে নিয়ে চলে এলেন শিল্পের স্তরে। বিজ্ঞান ও শিল্পকে সমন্বিতকরলেন আলোর তাপস। তাই তিনি আলোর শিল্পী এবং শিল্পী বলেইতাঁর সৃজনশীলতার সচেতনভাবে মিশে থাকে সমাজমনস্কতা। যে কেনও সার্থকশিল্পীকে সমাজ সচেতন হতেই হয়। তাই শিল্পী ত াপস সেনকেও বার বারসমাজ রাজনীতির নানা আহ্বানে নেপথ্যে থেকে বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়েছে'ধূসর প্রসর র াজপথে, জনতার মাঝখানে'। গড়ে উঠেছেনঅনুরাগে বিরাগে এক প্রতিবাদী তাপস। 'চলছে চলবে'উচচারণে ঘটেছিল ত ারই সামান্য প্রতিফলন।

৭

আসলে তাপস সেন এই রকম। 'কল্লোল' তোঅনেক পরের ঘটনা। জীবনের গোড়া থেকেই হাটতে চান নি বাঁধাপথে। ত াইনিতান্ত তণ বয়সেই পারিবারিক বাঁধা জীবিকার নিশ্চয়তা ছেড়েনিঃস্বলভাবে চলে গিয়েছিলেন বোম্বেতে কাজ শেখবার আগ্রহে। আলোর প্রতিতাঁর মানসিক সংলগ্নতা প্রায় কৈশোর থেকেই। তারপর নানাউচচাবচকতার মধ্য দিয়ে পৌঁছেছিলেন কলকাতায় ভরা যৌবনে। সিনেমার সঙ্গেতাঁর প্রথম পরিচয় ঘটলেও প্রণয় ঘটল থিয়েটারের সঙ্গে। তখনভ ারত স্বাধীন ও বঙ্গবিভাগ হতে চলছে। মাত্র দুতিন বছর আগে গণনাট্য আন্দোলনে যেজোয়ার এসেছিল তার স্রোত তখন খানিক থিতিয়ে এসেছে। গোড়ায় অবশ্য তাঁররাজনৈতিক সংসর্গ ঘটেছিল এস. ইউ. সি পার্টির সঙ্গে। অচিরেই ঘনিষ্ঠতাব াড়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে। যদিও কখনও আনুষ্ঠানিক সভ্য হন নি সম্ভবত।সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বামপন্থীদের নিবিড় সহমর্মিতা গঠন করেছে তাঁরমানসিকতাকে। কিন্তু ক্রমে তাঁর শিল্পীসত্তা অর্জন করেছে কর্মক্ষেত্রেরঅনন্য স্বাতন্ত্র্য। ১৯৫৪-থেকে তাঁর কাছ থেকে দর্শক ক্রমে পেয়ে এসেছে'রক্তকরবী' চার অধ্যায়' 'পুতুল খেলা' অথবা'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ' 'কল্লোল'প্রভৃতি প্রযোজনার কাব্য, 'মিশ্রিত যার প্রকৃতি পুষেললিতে'। অনুভূতির সুক্ষ্মতম ও বোধির প্রচণ্ডতমপ্রতিসরণে ন াট্য দর্শকদের হল আলো অন্ধকারের নান্দনিক অভিজ্ঞতা। পঞ্চাশদশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ও স্বীকৃতি ঘটলঅন্যতম প্রধান নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবে। এবং এ স্বীকৃতিই তাঁর কাছে দাবীকরল অস্ত্যর্থক প্রতিবাদ ও দৃঢ় দ

ায়বদ্ধতা। তারপর বিগত চারদশক ধরে চলছে তাঁর সৃজনে ও মননে এ দায়বদ্ধতার প্রতিফলন।
একজন প্রকৃত মার্কসবাদী সমালোচনাকে ভয় পাননা, এমনকী আত্মসমালোচনাকেও। তবে সে সমালোচনাকে অবশ্যই হতে হবে গঠনমূলক ওসৃষ্টিশীলতার সঙ্গে সংলগ্ন। শুধুমাত্র প্রতিবাদের জন্যইপ্রতিবাদ নিতান্তই অর্থহীন। একথা বলা হল এজন্যে যে তাপস সেনদীর্ঘকাল ধরে নিজের দায়বদ্ধতার তাগিদে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিবাদকরেছেন যা কখনও ব ামপন্থীদের কাছ থেকে পেয়েছে সোৎসাহ সমর্থন, আবারকখনও বা বিতর্ক এমনকী বিতৃষ্ণাও। তাপস সেন বামপন্থী, কিন্তু কোনওরাজনৈতিক দলের সদস্য নন তিনি। তার দরকারও নেই, কেননা কোনও দল সক্রিয়সদস্যের কাছে আশা করে শর্তহীন আনুগত্য, এমনকী মার্কসবাদী হলেও।মার্কস থেকে মাও সকলেই তাঁদের রচনায় চিরকাল আক্রমণ করে গেছেনএকধরনের অন্ধতাকে। তাপস সেনের প্রতিবাদ এ অন্ধতার বিদ্ধে, কর্মে ওমননে যাবতীয় অন্ধকারের বিদ্ধে। অবশ্য তঁ ার যাবতীয় প্রতিবাদেরপ্রতিটি বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে স্থানাভাবের জন্যেকরা যাবে না। তবে অবশ্যই প্রয়াস থাকবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারসমগ্রতাকে ধরবার।

৮

১৯৬২।১০ ডিসেম্বর সোমবার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে 'দ্য ক্যালকাটাগেজেট -এ প্রকাশিত হল 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক পারফরম্যান্সবিল ১৯৬২' য়ের সম্পূর্ণ বয়ান। তখন ভারত চীন সংঘর্ষের বয়স মাসদুয়েক, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। সারাদেশে কমিউনিস্টবিরোধিতা প্রবল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনে হল দেশের বামপন্থাকে দমনকরবার জন্যে দরকার নাট্যকর্মীদের কণ্ঠরোধ। বঙ্গদেশের নাট্যচর্চায়বরাবরই কিন্তু প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝোঁক ছিল। গণনাট্যআন্দোলনের প্রভাবে এবং নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বিভাগোত্তরপশ্চিমবঙ্গের নাট্যকর্মে বামপন্থী চিন্তার প্রতিফলন ছিলস্পষ্ট। তাই সরকার ১৮৭৬-য়ের নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলের উপরও চাপিয়েদিতে চাইল নতুন এক কঠে ারতর কালাকানুন। এই আইনের বলে যে কোনও objectional performance বন্ধ করে দেবারঅধিকার সরকার হাতে তুলে নিল। আইনে ব্যাখ্যা করে বলা হল 'drama' includes a melodrama, tragedy, comedy, farceplay, opera, interlude and any other scenic, musical or dramatic entertainment¼ ১৮৭৬-যেরআইনে ব্রিটিশ সরকারও নাট্যকর্মের প্রতি এতটা কঠোরতা দেখায়নি।স্বভাবতই সারা দেশে প্রবল প্রতিবাদ ধবনিত হল। সংগঠিত হল'সারা বাঙলা নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা সম্মেলন'। দলমতনির্বিশেষে এ আইনের বিদ্ধে সোচচার হলেন নাট্যকর্মী, সা হিত্যিক ও বিভিন্নক্ষেত্রের বুদ্ধিজীবী। প্রতিবাদ জানালেন বনফুল, সৈয়দ মুজতবা আলী, ডঃনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, সত্যজিৎ রায় প্রভৃতিঅগ্রগণ্য ব্যক্তি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে প্রতিবাদধবনিত হল যাদের মধ্যে ছিল বহুরূপী, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, গন্ধর্ব, থিয়েটারইউনিক, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং আরও অনেকে। এ পরিস্থিতিতেতাপস সেন লিখলেন, ''বাঙলা দেশের মত প্রবল ও ব্যাপকনাট্যচর্চা ভারতবর্ষের অন্য কোনও রাজ্যে নেই। গিরিশচন্দ্র শিশিরকুমারেরঐতিহ্যময় সাধারণ রঙ্গালয়ের নিয়মিত অভিনয়, অগণিত অফিস ক্লাব ও সৌখিনসংস্থার অসংখ্য অভিনয় এবং নবনাট্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা --- এসমস্তই সারা ভারতের আগ্রহ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। ব াঙলাথিয়েটারের সকল ভাল ও মন্দ নিয়ে এই প্রচন্ড প্রাণচাঞ্চল্য আমাদেরগৌরবের বিষয়। আজ পর্যন্ত বাঙলাদেশে বিভিন্নমুখী প্রযোজনা ও প্রয়োগপরীক্ষিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। কিন্তু 'নাটক নিয়ন্ত্রণআইন' করে সরকার ব াঙলা থিয়েটারের উপর যে যবনিকা টানতেচাইছেন তা আজ নাট্যমঞ্চের প্রত্যেক শিল্পী ও কলাকুশলীর ঘৃণা ওধিক্কারে ভূষিত হয়েছে।'' শুধু 'ঘৃণা ও ধিক্কারই' নয়,তিনি দীপ্ত ভাষায় জানালেন, ''১০ই ডিসেম্বরের (১৯৬২)অতিরিক্ত গেজেট আমার মত নেপথ্যকারীকেও পাদ প্রদীপের সামনে একনতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছে। এই নতুন আঙ্গিকের নতুন নাটকেরপ্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেনে রাখুন যে এই আইন আমাদের সকলশিল্প প্রেরণা ও শিল্প চেতনার প্রতি চরমঅপমান।'' আবেগ ও ব্যঙ্গে মেশা প্রতিবেদন প্রকাশ করলপ্রতিবাদী তাপসের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এ আইন নিয়ে পশ্চি মবঙ্গসরকার সে সময়ে কতটা নাজেহাল হয়েছিল তা আজ সকলেরই জানা।

ভারতচীন সংঘর্ষকে ভাঙিয়ে বামপন্থী বিরোধীরা পশ্চিমবঙ্গে ব্যর্থ হল। ইতিমধ্যেপ্রথম প্রধানমন্ত্রী জবাহর লাল নেহে প্রয়াত হলেন ১৯৬৪-তে। শাসককংগ্রেস তথা ভারতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যেও প্রকট হল সংকট। ১৯৬৫-তে'কল্লোল'। ভারত পাকিস্থান যুদ্ধ ১৯৬৫-তে। প্রধানমন্ত্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীও বিদেশে প্রয়াত হলেন ১৯৬৬-র গোড়ায়। কংগ্রেস ভাঙনেরমুখে দাঁড়িয়ে ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ। সরকারি নিপীড়নের বলিহলেন বহু মানুষ। তবু প্রতিরোধে অবিচল জনচিত্ত। এ জাগরণে নাট্যকর্মীদেরঅবদান অবশ্যই ছিল অনেকখানি। গুলিচালনার প্রতিবাদে কলকাতায় তখনদুটি মৌনমিছিল বেরিয়েছিল যার একটিতে অংশ নিয়েছিলেন বহু শিল্পীসাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি এবং সত্যজিৎ রায়। সম্ভবত সত্যজিৎ ঐ একবারই এইধরনের মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। এ মিছিল সংগঠিত করবার জন্যে যাঁরাপ্রবলভাবে সক্রিয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব হলেন সৌমিত্রচট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার ও আরও অনেকে এবং তাপস সেন। পরিস্থিতির এসকল অভিমতের ফল হল সুদুর প্রসারী। ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনেবিধানসভায় কংগ্রেস পেল মাত্র ১২৭টি আসন। অবশ্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বামপন্থীশিবিরকে বিভক্ত করে রেখেছিল। নির্বাচনের আগেও তাদের মধ্যে সমঝোতাহয়নি। বামপন্থী শিবিরের একটি অংশে ছিল সি.পি.আই (এম)নেতৃত্বাধীন ইউ, এল, এফ, এবং অন্য অংশটি পি. ইউ. এল. এফ নামে মূলত সি.পি. আই. পরিচালিত ছিল। অবশ্য দ্বিতীয় অংশে বাঙলা কংগ্রেস ও তার নেতাপ্রাক্তন কংগ্রেসী অজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রধান ভূমিকা ছিল।বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যলঘু হবার ফলে বামপন্থী দলগুলোরউপর দায়িত্ব বর্তাল একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে সরকার গড়বার। কিন্তুতারা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শুধু অফলপ্রসুআলোচনায় ব্যস্ত রইল। বৌবাজারে এমনি এক আলোচনা সভায় একদিন হঠাৎহাজির হলেন তাপস সেন। তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা হয়েছিল প্রবেশপথে, কিন্তু অদম্য তাপস সরাসরিনেতাদের কাছে প্র রাখলেন যেসাধারণ মানুষের ইচ্ছা নিয়ে এমনভাবে খেলা করবার অধিকার তাদেঁর আছেকিনা? নেতারা হতচকিত ওস্তম্ভিত। অকুতোভয় তাপস সোজা তাঁদের জানিয়ে দিলেন মন্ত্রীসভা গঠননিয়ে একধরনের গড়িমসি রাজ্যে বাম আন্দোলনের ক্ষতি করবে। আরও নানাকথা বলে কোনদিকে দৃকপাত না করে বেরিয়ে এলেন। সে সভায় অন্যান্যনেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং জ্যোতি বসু। যাই হোক, শেষপর্যন্ত বামদলগুলোর উভয়পক্ষ মিলিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাগঠিত হল এবং মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয় মুখোপাধ্যায় ও উপ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুঘনিষ্ট মহলে স্বীকার করেছিলেন তাপস সেনের দৃপ্ত ও অকুণ্ঠ অভিমানসময়োপযোগী ও যথাযথ ছিল।

এইহলেন তাপস সেন। হয়ত কিছুটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু সর্বদাই সমষ্টিমনস্কতাঁর এ অনন্যতা তাঁকে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সীমাবদ্ধতারমধ্যে বিচরণ করতে দেয় না। তারপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে,বামপন্থা থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি কখনই। তার চাইতেও বড়কথা---বিগত কয়েক দশক ধরে সংস্কৃতি এবং প্রয়োজনমত রাজনৈতিকক্ষেত্রেও অনিয়ম, অন্যায় বা অবিমৃষ্যকারিতা দেখলে তাঁর তীব্রপ্রতিবাদ বিস্ফোরিত হয়েছে।

যেমন হয়েছিল রবীন্দ্রসদন সম্পর্কিত জটিলতায়।অবশ্য তখনও 'রবীন্দ্রসদন' নাম হয়নি, নাম ছিল 'রবীন্দ্রস্মরণী'। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ। সে বছর পঁচিশে বৈশাখ (মেমাসে) নাট্যদলগুলো উদ্যোগ নিয়েছিল যাতে 'রবীন্দ্রস্মরণী'তে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে নাট্যোৎসবঅনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসী রাজ্য সরকার নাট্যদলগুলোর এপ্রয়াসে সরাসরি বাধা দিয়েছিল। তখন সম্মিলিত প্রতিবাদসংগঠিত হল প্রধানত তাপস সেন সবিতাব্রত দত্তের প্রণোদনায়। তাঁরা'রবীন্দ্র স্মরণী'র কর্তৃপক্ষ তথা রাজ্য সরকারকে সরাসরিজানালেন, "এই পরিস্থিতিতে, যথাযথ বিবেচনার পর সম্মেলনরবীন্দ্র স্মরণীর সংলগ্ন এলাকায় বিশ্বনন্দিত রবীন্দ্র কবি জন্মোৎসবউদ্‌যাপন করার ব্রতী হয়েছেন। সম্মেলন আশা করে এই ব্রত সমগ্রপশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রানুরাগীর ব্রত। আরব্ধ ব্রতে সকলের আনুকুল্য নাট্যসম্মেলন একান্তভাবে কামনা করে।" নাট্য সম্মেলনের এপ্রয়াসে সরকারি সমর্থন না মিললেও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ উৎসাহিতহয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।বহিঃপ্রাঙ্গনে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন সফল হয়েছিল।

তারপরপেরিয়ে আসি প্রায় এক দশক। ১৯৭০-থেকেই পশ্চিমবঙ্গে অন্ধকার রাজ্যেরশু। বামপন্থী সব ধরনের আন্দোলনের উপর নেমে আসছে আঘাত। ক্রমবর্ধমানসন্ত্রাস। নির্বিচারে খুন হচ্ছেন বামপন্থী নেতারা এবং ছাত্রযুব সম্প্রদায়।১৯৭২-এর অভূতপূর্ব 'গণতান্ত্রিক' 'শান্তিপূর্ণ' নির্বাচন।খুন জেলের মধ্যে, খুন পাড়ায় পাড়ায়। পুড়িয়ে দেওয়া হল 'ন্যাশনাল বুকএজেন্সি', ভস্মীভুত হল ত্রীক লেনের 'গণনাট্য' দপ্তর। প্রবলঅত্যাচার নেমে এল নাট্যকর্মীদের উপর। নিহত হলেন সত্যেন চক্রবর্তী, সত্যেনমিত্র এবং আরও অনেকে। নিহত হলেন সাংবাদিক সাহিত্যিক সরোজ দত্ত। কিন্তু ১৯৭৪-এর২০ জুলাই কার্জন পার্কের ঘটনা সব বর্বরতাকে যেন ছাপিয়ে গেল। খোলা ময়দানেনাট্যানুষ্ঠানে অত্যাচার চালাল সিদ্ধার্থ রায়ের পুলিশ। নিহত হলেননাট্যপ্রেমী তণ প্রবীর দত্ত। ব্রিটিশ আমলে নাটকের উপরআরপিত হয়েছিল নানা নিষেধাজ্ঞা, বাজেয়াপ্ত হয়েছিল বহু নাটক। কিন্তু'স্বাধীন' দেশে 'গণতন্ত্রের মহিমা' এভাবে অভিব্যক্ত হয় নি এরআগে। পি. এল. টি. প্রযোজিত উৎপল দত্তের 'দুঃস্বপ্নেরনগরী' হামলার ফলে বন্ধ হয়েছিল। হামলা হয়েছিল'রূপান্তরী' প্রযোজিত জোছন দস্তিদারের নাটকেরউপরও। এমনি আরও প্রচুর ঘটনা। সরকারের এ সংগঠিত বর্বরতারবিদ্ধে সোচ্চার হলেন প্রতিবাদী শিল্পীরা। ১৯৭৪-এর ২৪ আগস্টকার্জন পার্কের খোলা ময়দানে, যেখানে প্রায় মাসখানেক আগে প্রয়াতহয়েছিলেন প্রবীর, সেখানে নাট্যাভিনয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেঘোষিত হল এক কঠোর বিবৃতি। বলা হল--- "গত ২০শে জুলাই এইকার্জন পার্কে নাটক ও সংস্কৃতি কর্মীদের ওপর পুলিশী জুলুম নিলর্জ্জভাবেআত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রাণ দিয়েছিলেন তণ প্রবীর দত্ত। হত্যা,লাঠি চার্জ ও গ্রেপ্তারের সেই ঘটনায় আমরা গভীর উদ্বেগ বোধ করেছিলাম এবংআমাদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদকে ভাষা দিতে গত ৩-রা আগস্টইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে একটা কনভেনশন আহ্বান করেছিলাম।.... সেইকনভেনশন গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছিএই কথাই ঘোষণা করার জন্যে যে খোলা মাঠে অভিনয়ের অধিকার আমাদেরকাছ থেকে কেড়ে নেওয়া চলবে না। থিয়েটারের স্বাধীনতা আক্রান্ত হলেআমরা তার বিদ্ধে প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ।" আরও জানান হল,"এইসব ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। এই রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে যা ঘটছে তারইঅধুনিকতম নির্লজ্জতম দৃষ্টান্ত মাত্র।" সক্ষোভেউচ্চারিত হল, "আক্রান্ত শুধু থিয়েটার নয়। সমাজে সার্বজনীনসংবিধান দত্ত অধিকার বিপন্ন। বিপন্ন মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা,স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। মঞ্চের অভিনেতা, নাট্য সংস্থারপরিচালক, ধর্মঘটী শ্রমিক, ফসল রক্ষায় ব্যস্ত কৃষক, রাজনৈতিককর্মী, তণ ছাত্র, শহরের নিরীহ নাগরিক--- কারও রেহাই নেই।"সমাবেশে দাবীতে ভাষা দিয়ে ধবনিত হল, "খোলা মাঠে অথবা মঞ্চেরনাটকের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। থিয়েটারের স্বাধীনতায়হস্তক্ষেপ চলবে না। নাটক ও সংস্কৃতি জগতের উপর থেকে জুলুমেরকালো হাত তুলে নিতে হবে।.... প্রবীরের হত্যাকান্ডের নিরপেক্ষতদন্ত, ২০ জুলাই ধৃত সমস্ত সংস্কৃতি কর্মীদের বিদ্ধে মামলা প্রত্যাহার,তণ সমাজের উপর হামলার অবসান, রাজবন্দীদের মুক্তি, গণতান্ত্রিকআন্দোলনেপুলিশী হস্তক্ষেপের অবসান, 'দুঃস্বপ্নের নগরী'রবিদ্ধে মামলা প্রত্যাহার" করতে হবে। এ ঘোষণাপত্রেস্বাক্ষর করেছিলেন মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, অজিতেশবন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত চট্টাপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, শ্যামানন্দ জালান এবং তাপসসেন। তালিকার উপর চোখ বোলালেই লক্ষ্য করা যাবে রাজনীতি সংস্কৃতিও শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশ থেকেই এ যৌথ প্রতিবাদটি ধবনিতহয়েছিল।

কিন্তুঅত্যাচার থেমে থাকে নি। বরং ১৯৭৫-এ ঘোষিত হল সারা দেশে জরী অবস্থা।প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম 'প্রধান' উপদেষ্টাসিদ্ধার্থ রায়ের 'জরি' পরামর্শে জনমতের উপর চাপিয়ে দেওয়াহল প্রবলতর সন্ত্রাস। কন্ঠরোধ করা হল শুধু নাটকের কেন, যে কোনও মতপ্রকাশের স্বাধীনতারও। এমনকি রবীন্দ্রনাথের উপরও নেমে এল নিষেধেরকাঁচি। কিন্তু প্রবলের উদ্ধত অন্যায় সভ্যতার শেষ কথা নয়। তাই এইঅবিবেকী অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯৭৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের হলভরাডুবি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বিধানসভায় প্রায় মুছে গেল। তারপরবহু উচ্চাবতার মধ্যে দিয়ে এ রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে আরও তিনটিবিধানসভা নির্বাচন। কংগ্রেস তার শক্তি আর তেমন বাড়াতে পারে নি। গতপনের বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। বিগত বছরগুলোতেক্রমে এ সরকারের সঙ্গে তাপস সেনের গড়ে উঠেছে অনুরাগ বিরাগে এক তির্যকসম্পর্ক।

ঐপ্রসঙ্গে প্রবেশের আগে আবার একটু পিছিয়ে যাই ১৯৬৫-তে। এবছরের১৮ ফেব্রুয়ারী স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল বিমল মিত্রের উপন্যাসঅবলম্বনে রচিত নাটক 'একক দশক শতক'। এ নাটকেরকালোবাজারির মাথায় গান্ধীটুপি পরানো

হয়েছিল। স্বভাবতই কংগ্রেস থেকেপ্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল। কংগ্রেস নেতা তণকান্তি ঘোষথিয়েটার কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করলেন। কর্তৃপক্ষবিপাকে পড়লেন। নাটক প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়। তাপস সেন এ খবরপেয়ে ক্ষেপে গেলেন। প্রতিআক্রমণ করার জন্যে তিনি একটি আশ্চর্যতীক্ষ্ণ আয়ুধ বেছে নিলেন। সে সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন বিভাগথেকে কালবাজারির বিদ্ধে একটি হোডিং ছিল পার্কস্ট্রীটের মোড়েগান্ধীমুর্তির ফেনসিংয়ের দিকে। তাতে কালোবাজা রিটিকে দেখান হয়েছিলগান্ধীটুপি পরিহিত অবস্থায়। তাপস সেন সে বিজ্ঞাপনটির কয়েকটিফটো তুলে প্রতিবাদীদের কাছে পাঠিয়ে প্রমাণ করলেন খোদকেন্দ্রীয় সরকারই কালোবাজারিদের এ ভোল মেনে নিয়েছেন। স্বয়ংতণকান্তিও বোধহয় এ ধরনের পরিণতির কথা ভাবেন নি। তিনি থমকেগেলেন। অবশ্য বিমল মিত্র ও থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ঝামেলা এড়ানোর জন্যে টুপিখুলে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে পরিণতি যাই হোক না কেনব্যাপারটাতে অন্য এক তাপস সেনের পরিচয় মেলে।

১০

বামফ্রন্টসরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর থেকে 'তথ্য ও জনসংযোগ'বিভাগের মাধ্যমে এ রাজ্যে নাট্য ও যাত্রার বিকাশের জন্যে পরিকল্পনা নিতেথাকে। গোড়া থেকেই এসব পরিকল্পনার সঙ্গে অন্যান্য নাট্যব্যক্তিত্বের মধ্যেতাপস সেনও জড়িত থাকেন। একটি নাট্যকেন্দ্র স্থাপন করার প্রচেষ্টাহয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ তারিখের সভায় উপস্থিত সভ্যগণস্থির করেন এ নাট্যকেন্দ্রটির নাম হবে 'পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয়নাট্য কেন্দ্র।' তার আগে এটিকে 'জাতীয় নাট্যশালা' বলে অভিহিতকরার প্রস্তাব হয়েছিল। নানা গঠনমুখী প্রকল্প নিয়েছিল এ'নাট্যকেন্দ্র'। পরে এটিই পরিণত হয়েছে 'নাট্যএক াডেমি'-তে। বরাবরই তাপস সেন একাডেমির অন্যতম প্রধান সদস্য।
'নাট্যকেন্দ্র'প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই তার কর্মপদ্ধতি তাপস সেনসর্বথা নিঃশর্ত সমর্থন করতে পারেন নি। সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজেরদীর্ঘসূত্রতাও তাঁর সবসময়ে ভাল লাগে নি। তাই প্রতিষ্ঠানটিরজন্মলগ্ন থেকেই তার সঙ্গে আদ্যোপান্ত জড়িত থেকেওপ্রয়োজনমত প্রতিবাদ করতে থাকেন। তাঁকে না জানিয়ে কোনওসভা হলে অথবা সভার চিঠি সময়মত না পৌঁছলে তার কারণ জানতে চেয়েছেন।সংশ্লিষ্ট পক্ষ অবশ্য গোড়ার দিকে এসব প্রশ্নের উত্তরদিয়েছেন বা দিতে চেষ্টা করেছেন। সব উত্তরই যে তাপস সেনকেপ্রসন্ন করেছে তা হয়ত নয়, এমনকী কখনও কখনও তাঁর জিজ্ঞাসু মনোবাবেসরকা রি বিভাগ বিব্রত হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ ওপরিসর এখানে নেই। তবু এলমেলোভাবে কিছু তথ্য এখ ানে পরিবেশিত হচ্ছে।

১৯৭৮-এর২৪ শে অক্টোবর 'তথ্য ও জনসংযোগ' বিভাগের মন্ত্রী বুদ্ধদেবভট্টাচার্যের কাছে শিশির মঞ্চের ব্যবস্থাপনা, অন্ধ্রের বন্যাবিধবস্তদুর্গতদের সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠানের পরিণতি, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নজেলার রবীন্দ্র ও অন্যান্য মঞ্চ, ক্যালক াটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টেরজমিতে নাট্যমঞ্চ নির্মাণ, চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চ, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশদজানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। এ সকল বিষয়ে সরকারের কি করা দরকারও বিদেয় তারও বিস্তৃত পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরকাছে পাঠান কিছুকাল পরে ১৯৭৯-এর ১২ ফেব্রুয়ারী। এ প্রস্তাবেতাপস সেনের সঙ্গে স্বাক্ষর করেছিলেন অনুপকুমার, শিশির সেন ও জোছনদস্তিদার। ২৬ ফেব্রয়ারি সরকারি দপ্তর থেকে গঠনমূলক জবাব মেলে। তবুযেন কোথায় বেসুর বাজতে থাকে। তখনও'নাটক যাত্রা লোকরঞ্জন উপদেষ্টা পর্ষদ' বলে সরকারেরতথ্যবিভাগের অধীনে একটি সংস্থা ছিল যা পরে 'নাট্য একাডেমির সঙ্গেমিশে যায়। উপদেষ্টা পর্ষদের একজন সদস্য হিসেবে তাপস সেন শ্রীবুদ্ধদেবভট্টাচার্যের কাছে ১৬.৮.৭৯ তে লেখা চিঠিতে জানিয়েছেন"প্রায় দু'বছর হতে চলল পর্ষদ গঠিত হয়েছে এবং এইদীর্ঘ সময় নানা অসুবিধার মধ্যে পর্ষদ খুব একটা কাজ করতে পারেনি।" তিনি স্বীকার করেন "এর জন্যে যদিও সরকারীপ্রশাসনের নিয়মকানুনই মূলত দায়ী, তবু আমাদের সকলেরই যথাযোগ্যকাজ করতে পারার অক্ষমতা" ও রয়েছে। তবে তিনি জানানসরকারী অফিসারদের কাছ থেকে নানা জরি বিষয়ে 'দায়সারাউত্তর' আশা করেন না। উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী শুধু চিঠির প্রাপ্তিসংবাদজানালেন এক ল াইনে। তবু তাপস সেন অদম্য। মিনার্ভা থিয়েটারের কর্মী ওকলাকুশলীদের সমস্যা নিয়ে প্রতিবেদন পেশ করলেন প্রায় এ

সময়েইএবং সঙ্গত সমাধান চাইলেন। এ ধরনের আরও কিছু বক্তব্যের জবাবে শ্রীবুদ্ধদেবভট্টাচার্য ২১ নভেম্বর সেনকে একটি চিঠি দিয়ে জানালেন, "আপনিআমাদের উপদেষ্টা কমিটির একজন সদস্য। উপদেষ্টা কমিটির সভায়যে আলোচনা হয় আপনিও তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং মতামত দেন। কিন্তু এরপাশাপাশি চিঠিপত্রে এই সংবাদ আদান প্রদান সম্পর্কে আপনার উৎসাহেরজন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু আমাদের পক্ষে সবসময়ে সেই ভাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়না, কাম্যও নয়। আপনার মতামত ভবিষ্যতে কমিটির সভায় জানাবেন এবং এইপদ্ধতিতে চিঠি না দিলে খুশি হব।" মাননীয় মন্ত্রীর চিঠি খুবইসংক্ষিপ্ত ও তীক্ষ্ণ এবং বক্তব্য প্রাঞ্জল। কিন্তু সত্যের খাতিরে স্বীকারকরতেই হবে সরকারী দপ্তরের কাজ ত শুধুমাত্র আলোচনা সভায় মত বিনিময়েরমধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হয় না, প্রস্তাব অনুযায়ী কাজকে ফলপ্রসু ওত্বরান্বিত করাও দরকার। অন্তত বামফ্রন্ট সরকারের কাছে সমর্থক ওশুভানুধ্যায়ীদের সেটাই কাম্য।
প্রসঙ্গতকলকাতা অথবা জেলায় রবীন্দ্রভবন বা অনুরূপ প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের কথাবলা যায়। বামফ্রন্ট সরকার এ বাবদে উপযোগী ও দরকারী পরিকল্পনাকরেছেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেছেন। তাপস সেনের অভিমত হলপ্রেক্ষাগৃহগুলো নির্মাণে যেমন আর্কিটেক্টদের সাহায্য নেওয়া হয়তেমনি মঞ্চ বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ যাঁরা আলো, শব্দ ইত্যাদি প্রক্ষেপণ করবেনতাঁদেরও পরামর্শ সূচনাপর্বেই সংগৃহীত হওয়া দরকার। কেননা দর্শক যদিআসনে সঠিকভাবে বসতে না পারেন, মঞ্চের কলাকুশলীদের সৃজিত শিল্পযথাযোগ্য উপভোগ করতে না পারেন, প্রেক্ষাগৃহের প্রতিধ্বনিত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে অনুষ্ঠানের, তা নাট্য প্রযোজনা বা অন্য যাকিছুর হোক, সফলতা হতে পারে না।

অনুরূপসমস্যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে তাপস সেন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন। উত্তর পান নি।তৎকালীন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষকে চিঠি দিয়ে জবাব পেয়েছিলেন এবংপরে কিছু ফলপ্রসু আলোচনাও হয়। তবু তাপস সেন থেমে থাকেন না, যা নিজের কাছে উচিত ও দরকারি বলে মনে হয়, নিজের মত করে বলে যান কিছুপরোয়া না করেই। তাই নাট্য একাডেমির অস্থায়ী কর্মচারীদেরস্থায়ী করার প্রশ্ন নিয়ে, ওয়ার্কশপের পদ্ধতি প্রভৃতিবিষয় নিয়ে ক্রমাগত প্রত্যয়ী অভিমত প্রকাশ করে যেতে থাকেন।সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁর নিরলস প্রশ্ন ও প্রতিবাদেপ্রায়শই বিচলিত হয়ে পড়েন, কিন্তুসর্বব্যাপারে তাঁরআন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ করার অবকাশ থাকে না।

আবারএকটু পিছিয়ে যাই। এবার অন্য প্রসঙ্গ। ১৯৮০। কলকাতার নাট্যকেন্দ্রপ্রযোজনা করেছিল 'গ্যালিলেওর জীবন'। কলকাতার বিভিন্ননাট্যদলের যৌথপ্রয়াস ছিল এটি। সংগঠক ছিল নান্দীকার, থিয়েটারওয়ার্কশপ, চেতনা, থিয়েটার কমিউন, চার্বাক, শূদ্রক প্রভৃতিনাট্যদল। পরিচালক ছিলেন পূর্ব জার্মানীর হাইমের ন্যাশনাল থিয়েটারেরফ্রিৎস বেনেভিৎস। ব্রেখটের এ নাটকটি বাংলা অনুবাদ করেছিলেন মোহিতচট্টোপাধ্যায়, মঞ্চ জোছন দস্তিদার, সংগীতে দেবাশিষ দাশগুপ্ত, রূপসজ্জায়শক্তি সেন এবং আলোক শিল্পি ছিলেন তাপস সেন। অভিনয়ে ছিলেন স্বাতীলেখাসেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তী, রাম মুখোপাধ্যায়, শাঁওলী মিত্র, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত,বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত,জোছন দস্তিদার প্রভৃতি কলকাতা মঞ্চের বিভিন্ন অভিনেতৃবর্গ। এবংগ্যালিলেওর ভূমিকায় স্বয়ং শম্ভু মিত্র। দীর্ঘকাল পরে কলকাতা দর্শকদের কাছেএকটি নতুন ভূমিকায় আবির্ভূত হলেন তিনি। স্বভাবতই নাট্যপাগল কলকাতাকাঁপছিল। কিন্তু হঠাৎ কর্তৃপক্ষ দুজন বিশেষ দর্শককেপ্রেক্ষাগৃহে প্রবেশের বিদ্ধে আপত্তি জানাল। তার মধ্যে একজনেরটিকিট সংগ্রহ করেছিলেন তাপস সেন। তিনি সংগঠকদের একজন হলেও এবং আলোরদায়িত্বে থাকলেও এ অন্যায় ফতোয়া মেনে নিতে পারলেন না। সংগঠকরাপ্রায় প্রত্যেকেই তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র। তবু তিনি প্রতিবাদেকুণ্ঠিত হলেন না। ১৯ ডিসেম্বর তারিখে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে জানালেন,"যখন গ্যালিলেওর জীবন-এর প্রস্তুতিপর্ব এবং আমার আলোকপরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ তখন আসন সংরক্ষণ ও ব্যক্তিবিশেষকে চিহ্নিতকরে হলে আটকানোর সিদ্ধান্ত আমাকেও জানান হয়। প্রতিবাদস্বরূপআমি কলকাতা নাট্যকেন্দ্রের উপদেষ্টা পদ থেকে এই অন্যায় নজিরসৃষ্টি করার বিদ্ধে পদত্যাগপত্র দিয়েছি প্রথম অভিনয় রজনীতে।নাট্যকেন্দ্রের পক্ষ থেকে ওঁরা বলেছেন--- ঐতিহাসিক মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গেঅগ্রণী কয়েকটি নাট্যদলের হয়ে নাট্য আন্দোলনের স্বার্থের কথা। কিন্তু ওদেঁরএই দৃষ্টিভঙ্গি (যা নাট্যকার ব্রেখট ও এই নাটকের শ্রদ্ধেয়পরিচালক বেনেভিৎস মহাশয়ের ভাবনার বিরোধী) নাট্যশিল্পে ঐক্যবদ্ধআন্দোলনের বিরোধী, জনবিরোধী ত বটেই।" অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন ত

াপস সেন সুহৃদদের কাছে, অনুজপ্রতিম নাট্যকর্মীদের কাছে স্নেহবদ্ধ, কিন্তু তারচাইতেও বেশি দায়বদ্ধ সত্যের কাছে। অন্যায়ের বিদ্ধে তাই তিনি সর্বদাই সোচচার। এ জন্যেই তিনি স্বতন্ত্র। তাই তিনি আলোর তাপস।

(তাপস সেনের নির্বাচিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'অন্তরঙ্গ আলো-র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ১৯৯২।)

বিষ্ণু বসুরজন্ম অবিভক্ত বাংলার ঢাকা শহরে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর কলকাতায় আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., পি. এইচ. ডি.। কলকাতা মহাকরণ, বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজে কাজকরেছেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েন াট্যবিভাগে অধ্যাপনাও করেছেন। বর্তমানেঅবসরপ্রাপ্ত। পিতৃসূত্রে নাটক ও থিয়েটারেরপ্রতি আগ্রহ। কিছুকাল ভ ারতীয়গণনাট্য সংঘের একটি শাখার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। নাটক ছাড়াও সাহিত্য ও শিল্পেরনানা বিভাগে তাঁর আকর্ষণ। নাট্য বিষয়কপ্রবন্ধের বই ছাড়াও কিছু পূর্ণাঙ্গ ও একাংক নাটক লিখেছেন। বহু গুরুত্বপূর্ণ বই সম্পাদনা করেছেন। একাধিক বিদেশি নাটকরে ভাষান্তর করেছেন। এখনও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখে থাকেন। তাঁর লেখা প্রকাশিত প্রবন্ধের বই - বাংলানাট্যরীতি, বাবু থিয়েটার, রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার, রাজনীতি নাটকে রাজনীতিথিয়েটারে, ধনঞ্জয় বিরচিত দশরূপক (অনুবাদ ও টীকা) প্রভৃতি;রম্যরচনা - থিয়েটারের গালগল্প, ইতিহাসের কলকাতায়; নাটক - মান্যবরভুল করছেন, থিয়েটারের মেয়ে ও অন্যান্য একাংক।

তাপস সেন বাংলারনাট্য জগতে একটি উজ্জ্বল নাম। মঞ্চেরআলোকশিল্পকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন তিনি নিজ উদ্ভাবনী প্রতিভার মৌলিকতার প্রাচুর্যে। শুধু আলাক তথা নাট্যশিল্পী নন, মানুষ তাপসসেন ও যে কতখানি উল্লেখযোগ্য তারই এক দলিল বিষ্ণু বসুর এই লেখাটি। এইপ্রবন্ধটি গণমন প্রকাশনা দ্বারা প্রকাশিত তাঁর 'থিয়েটার ভাবনা' গ্রন্থেসংকলিত রয়েছে।